যুগান্তর

তারিখ ১০ MAY 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

কা জী ফা রু ক আ হ মে দ

এমপিও নিয়ে ক্ষোভ ও ভাবনা

> কারও কাছ থেকে শ্রম আদায় করলে তার শ্রমের মূল্যও পরিশোধ করতে হয়। তার পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে ভাবা যেতে পারে। মানুষের হাতে তৈরি সব ব্যবস্থাই পরিবর্তন ও সংস্কারযোগ্য। তবে সে পরিবর্তন অবশ্যই হতে হবে উন্নততর।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন করে আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির বিপক্ষে তিনি। কারণ এ পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এতে দুর্নীতি হয়। এমনও প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ১০ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক ৫ জন। অর্থ মন্ত্রণালয় সমীক্ষা করে দেখেছে, সঠিকভাবে অর্থ ব্যয় হয় না। অর্থমন্ত্রী আরও বলেছেন, মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। এলাকা, প্রাপ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফল, শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে অর্থ সহায়তা দেয়া হবে। অর্থমন্ত্রীর কথার সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক 'উর্বর মাঠে বীজ বোনা : যে শিক্ষা বাংলাদেশে কাজে লাগবে' শীর্ষক প্রতিবেদনে বর্ণিত বক্তব্যের মিল আছে। সেখানে বিশেষণী সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে মাসিক বেতন-আদেশ (Monthly Pay Order—MPO) নামে একটি ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থা তার ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত হলেও শিখন ও শিক্ষণে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে এমপিও ব্যবস্থার সঙ্গে ফলপ্রসূভাবে যুক্ত করা আসলে কঠিন, তবে শিক্ষকদের ভালোভাবে উদ্বুদ্ধ করে এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারলে সেটি খুব বাঞ্ছনীয় হবে।'

এমপিও প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর ক্ষোভ নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। তবে যোগ্যতার সব শর্ত পূরণ করেও বছরের পর বছর এমপিও না পাওয়া লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষোভের ধরন ও মাত্রা ভিন্ন। তাদের ক্ষোভের পেছনে আছে বঞ্চনাবোধ।

এমপিও-বঞ্চিতদের ক্ষোভ কি অন্যায্য? কাউকে বছরের পর বছর বিনা পারিশ্রমিকে খাটানোর পেছনে কী যুক্তি থাকতে পারে? প্রয়োজন না থাকলে, কারও কাজ ভালো না লাগলে মিথ্যা আশ্বাস না দিয়ে তাকে সসম্মানে বিদায় করাই বেশি মানবিক। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২৩ অনুচ্ছেদের ৩ ধারায় আছে : 'কর্মরত প্রতিটি মানুষের কাজের ন্যায্য ও সন্তোষজনক পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার আছে, যা পরিবার-পরিজন নিয়ে সম্মান ও মানবিক মর্যাদার সঙ্গে তার জীবনযাপন নিশ্চিত করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রয়োজনমতো অন্যবিধ সামাজিক সুরক্ষা।' মানবাধিকার ঘোষণার ২৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে : 'প্রত্যেকেরই যুক্তিসঙ্গত শ্রমঘণ্টার সীমারেখা ও প্রচলিত নিয়মে বেতন-ভাতাসহ বিশ্রাম ও অবকাশ ভোগের অধিকার আছে।'

মনে রাখা দরকার, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও একদিনে হয়নি। দেশে এক দশকের শিক্ষক আন্দোলন যেমন এমপিও'র ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, অন্যদিকে চার দশকের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন সময়ে নেয়া সিদ্ধান্ত এর বর্তমান অবয়ব ও অবস্থান তৈরি করেছে।

স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসনের জন্য ছিল মাত্র একটা বিভাগ। এর প্রধান ছিলেন 'ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' (ডিপিআই)। তার প্রধান কাজ ছিল শিক্ষা বিস্তারে সরকারি নীতির প্রবর্তন এবং সরকারি কলেজ ও সরকারি বিদ্যালয়গুলোর তত্ত্বাবধান। তখন সরকারি স্কুল ও কলেজের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় ৯৮ শতাংশ কর্মকাণ্ডই স্থানীয় প্রচেষ্টায় বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত হতো। বস্তুত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি কারিকুলাম অনুসরণ ছাড়া বাকি সব প্রশাসনিক কাজই পরিচালনা কমিটির ওপর ন্যস্ত ছিল। সে সময়ে মাঝে-মধ্যে প্রতিষ্ঠানে সামান্য যে সরকারি সাহায্য দেয়া হতো তার ব্যয়ের যথার্থতা নিরূপণের প্রতি সরকার গুরুত্বও দিত না। উল্লেখ্য, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলনের মুখে শিক্ষকদের শান্ত করার জন্য ১৯৭০ সালে ১ জুন থেকে শিক্ষক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। তবে তার পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য। ফলে প্রতিষ্ঠানভেদে স্থানীয় ভিত্তিতে আয়-উৎসের পার্থক্যজনিত কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ছিল বিভিন্ন রকম এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা থেকে তা ছিল অত্যন্ত কম। যেমন ০১.০৬.৭০ থেকে একজন প্রশিক্ষণহীন সহকারী শিক্ষককে দেয়া হতো মাসিক ৪০ টাকা কল্যাণ ভাতা। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় তা বেড়ে ১৯৭৪-এর ১ জানুয়ারি থেকে হয় ৭৫ টাকা। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সঙ্গে সরকারের আলোচনার পর ১৯৭৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তা ১০০ টাকা এবং ১৯৭৮ সালে ১৭৫ টাকায় উন্নীত হয়।

১৯৭৮ সালের শেষ ভাগে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা চাকরির সুসামঞ্জস্য শর্তাবলী নির্ধারণ এবং বেতন ও সরকারি অনুদান বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে নামেন। এ সময় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে একটি সরকারি প্রেসনোট জারি হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়, 'সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষকগণের চাকুরীবিধি প্রণয়ন সম্পর্কে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।' আরও উল্লেখ করা হয় যে, 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নিম্নতম বেতনক্রম প্রবর্তন এবং এই বেতনক্রম প্রচলনের লক্ষ্যে সরকারি অনুদান বৃদ্ধির দাবির বিষয়েও সরকার সচেতন। তবে এইরূপ বেতনক্রম প্রবর্তনের সহিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির সমস্যাও জড়িত। এই সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করিয়া একটি রিপোর্ট প্রদানের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কাজি আনোয়ারুল হককে সভাপতি করিয়া একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হইবে।' ৮ মে, ১৯৭৯-এ কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৫ মে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৯টি সভায় মিলিত হয়ে কমিটি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দাবির বাস্তবতা উপলব্ধি করে ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ০১.০১.৮০ থেকে কার্যকর সাপেক্ষে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুরূপ পে-স্কেল চালু করা হয়। প্রাথমিকভাবে বেতন স্কেলের ৫০ শতাংশ শর্তাধীনে প্রদান করা শুরু হয়। কালক্রমে এই হার ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০ শতাংশে উন্নীত হয়। বর্তমানে বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক ১০০ শতাংশের সঙ্গে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একটি টাইম স্কেল, বাসা ভাড়া ৫০০ টাকা, দুই ঈদ/পূজা/ধর্মীয় উৎসবে ২৫+২৫=৫০ শতাংশ উৎসব ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ৩৫০ টাকা, ১৯৯১-এ প্রচলিত স্কেলে একটি বার্ষিক প্রবৃদ্ধির সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে এমপিওভুক্ত স্কুল ১৬ হাজার ৮৫। মাদ্রাসা ৭ হাজার ৫৯৮। কলেজ ২ হাজার ৩৬৩। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা— স্কুলে ২ লাখ ৩৩ হাজার ৮৩৭; মাদ্রাসায় ১ লাখ ৪৭ হাজার ৭৭৫; কলেজে ৮৮ হাজার ৫৫৮; এসএসসি ভোকেশনালে ৮ হাজার ৪২৭; এইচএসসি বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ৭ হাজার ৯৮৫। বর্তমানে মোট এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৪ লাখ ৮৬ হাজার ৫৮২। উল্লেখ্য, টাঙ্গাইলের একটি কলেজ বাদে দেশের অনার্স-মাস্টার্স শ্রেণীতে পাঠদানকারী কোনো কলেজ শিক্ষক এমপিওভুক্ত নন। সরকার নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করে প্রায় এক/দেড় দশক ধরে এমপিওর জন্য অপেক্ষমাণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭ হাজার। শিক্ষক-কর্মচারী লক্ষাধিক। ডিগ্রি কলেজের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানকারী তৃতীয় শিক্ষকরাও আছেন এর মধ্যে। তারা সবাই পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। মাঝখানে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ১ হাজার ৫৬২ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে। বিএনপি আমলে বন্ধকৃত টাইম স্কেলও তারা আবার চালু করে।

আগেই বলেছি, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করায়, শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা প্রদানের প্রচলন একদিনে হয়নি। প্রায় অর্ধশতক ধরে এটা এখন নিয়মে দাঁড়িয়েছে। তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্তে এর বিলোপের ভাবনা বাস্তবসম্মত নয়। কারও কাছ থেকে শ্রম আদায় করলে তার শ্রমের মূল্যও পরিশোধ করতে হয়। তার পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে ভাবা যেতে পারে। মানুষের হাতে তৈরি সব ব্যবস্থাই পরিবর্তন ও সংস্কারযোগ্য। তবে সে পরিবর্তন অবশ্যই হতে হবে উন্নততর। ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা অবসান প্রসঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, ভারতের নারীদের মৃত্যুবরণের কথিত 'অধিকারের' পরিবর্তে ইংরেজ শাসকরা বেঁচে থাকার অধিকার চালু করে। পক্ষে-বিপক্ষে মত যাই থাক, এমপিওর বিপরীতে টেকসই গ্রহণযোগ্য মর্যাদাকর পন্থা ছাড়া কোনো পদক্ষেপই ধোপে টিকবে না। অর্থমন্ত্রী যে নতুন ব্যবস্থার কথা বলেছেন, তা কবে থেকে কার্যকর হবে সেটা স্পষ্ট করেননি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা আছে : 'সকল পর্যায়ের সকল ধারার সকল স্তরের এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণের চাকুরী সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় বদলিযোগ্য হবে।' আরও বলা হয়েছে, 'আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে।' এ দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে, সর্বোপরি শিক্ষায় প্রকৃত বরাদ্দ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে অর্থমন্ত্রী কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দিলে তা সবার কাছে বিবেচনাযোগ্য হতে পারে। আজকের লেখার ইতি টানব সবিনয়ে দুটি প্রশ্ন রেখে। এক, পারফরম্যান্স যদি এমপিও দেয়ার ভিত্তি হিসেবে বিবেচ্য হয়, তাহলে দেড়/দুই দশক ধরে ভালো রেজাল্ট করা স্কুল-কলেজগুলোর বেশ কয়েকটি এখনও এমপিওভুক্ত না হওয়ার কারণ কী? দুই, যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক ব্যালেন্স এক থেকে তিন ডিজিটের কোটি টাকার মধ্যে, তাদের এমপিও দেয়া হয়ে আসছে কোন যুক্তিতে? মোট কথা, সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়, সবদিক ভেবেচিন্তে।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট-এর চেয়ারম্যান, শিক্ষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা*
principalqfahmed@yahoo.com